১৮৭৬ সালে কলকাতা 'ন্যাশনাল মেলায়' কবিবর নবীনচন্দ্র সেন গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোরকে কবিতা পাঠ করতে দেখে ও শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল "বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে"। নবীনচন্দ্রের যাকে ১৮-১৯ বছর বয়েসের 'সুন্দর নব-যুবক' মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তার বয়েস তখন ১৫-র বেশি নয়। সেই কিশোরের 'মধুর কামিনী-লাঞ্জন কন্ঠে' কবিতা ও গান শুনে নবীনচন্দ্র এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে দু'দিন পরে চুঁচড়োয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মশাইয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও সে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সে কথা শুনেই বললেন, "কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচা মিঠা আঁব।"

রবীন্দ্রনাথের যখন তিরিশ বছর বয়েস, তখন তিনি অভিহিত হন বাংলার শেলী হিসেবে, কিন্তু তিনি যে শেলীর চেয়েও অনেক বড় কবি তা তিনিই প্রমাণ করে দেন অচিরে। মধুসূদন-হেম-নবীনও ম্লান হয়ে জান তাঁর কাছে। পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরুবার পর তিনি সারা পৃথিবীতেই একজন বিস্ময়কর কবি হিসেবে গণ্য হন।

সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ শুধু পাঠকদের ভালোবাসাই নয়, বহু বিদ্বজ্জনের অকুন্ঠ শ্রদ্ধাও পেয়েছেন, বঙ্কিম তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

উনিশ শো তিরিশ দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিরুদ্ধে এক প্রকার আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন তরণদের এই যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা, তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে হেয় করবার জন্য মোটেও নয়। এই সব তরুণেরা প্রকাশ্যে উচ্চ কন্ঠে রবীন্দ্র-বিরোধী কথাবার্তা বললেও রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনর্গল রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলে যেতেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা তন্ন তন্ন করে যে পড়েনি, তার বাংলা ভাষায় কলম ধরার অধিকার নেই।

শতাব্দীর শেষবেলায় দাঁড়িয়ে 'মায়ার খেলা' লেখার বছরটির দিকে তাকালে (১৮৮৪) মনে হয় কী দুর্মর তাঁর আধুনিকতা। কী অনায়াসে সে শতাব্দী ডিঙিয়ে এসে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতাকে কখনও উপহাস, কখনও তিরস্কার করছে এবং কৃচিৎ চকিত পুলকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। এখনও ষোলো-সতেরো কোটি মানুষ তাঁর গান গায়, সেটা বিংশ শতাব্দীর পরিমাপে অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেননা, বেগবান শতাব্দীর অন্যতম সুগুণ বা দুর্গুণ : তার নির্মম মুগুরে অজস্র মূর্তি, অনেক দেবত্ব এবং প্রভূত চিন্তা ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু শতাব্দীর মৃত্যুদন্ড যাদের স্পর্শ করার স্পর্ধা পায়নি, সেই স্বল্পতম মনীষার একজন তিনি।

সম্পাদক